ভোটকেন্দ্রের আশপাশটায়!

পর্যবেক্ষক ও লেখক : নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, সকাল ১০টা । একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন। ঢাকা-১৯ আসনের পাথালিয়া ইউনিয়নের একটি ভোটকেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কেন্দ্রের ফটকে ২০-৩০ জন ভোটারের নাতিদীর্ঘ সারি, কয়েক মিনিট পরপরই দু-তিনজন করে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে। তবে ভোটারদের বাইরেও একদল মানুষের জটলা দেখা যাচ্ছে সেখানে, জটলায় যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা ভেতরেও ঢুকে যাচ্ছে না আবার সেখান থেকে সরেও যাচ্ছে না, দেখে মনে হচ্ছে কেউ বোধ হয় তাদেরকে এখানে জটলা করেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে; কেননা জটলা হলেও এখানে কোন হম্বিতম্বি নেই, চিলাপালা হৈ-হুল্লোড় নেই। তবে একটু দূর থেকে ভোটকেন্দ্রের ফটকের দিকে তাকালে এই জটলাটি যখন নজরে আসে তখন প্রথম যা মাথায় আসে তা হল, কেন্দ্রের ফটকে বোধ হয় কোন গোলমাল হচ্ছে! জটলার মানুষগুলো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাতেই ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বা বের হতে সমস্যা হচ্ছে ভোটারদের। জটলার ভেতরের ষণ্ডাগোছের কয়েকজনকে দেখা গেল ভোট দিয়ে আসা ভোটারদের কাছে গম্ভীরভাবে জানতে চাচ্ছে যে তারা কোন মার্কায় ভোটটা দিয়ে এসেছে! ভোটারদের অধিকাংশই প্রথমবার প্রশ্নে উত্তর দিচ্ছেন না, দ্বিতীয়বার ধমক দিলে জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা উত্তর দিচ্ছেন এবং সব ভোটারেরই উত্তর একই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, এই জটলা যাঁরা করেছেন তাঁরা পূর্বপরিচিত এবং একই রাজনৈতিক মতাদর্শের। তাঁদের প্রত্যেকের শরীরের কোন না কোন জায়গায় সরকার দলীয় প্রতীক শোভা পাচ্ছে। ভোটকেন্দ্রের ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশদের দেখে মনে হচ্ছে, নির্বাচনি ডিউটি দেয়ার বিষয়ে এই জটলার কাছে তারা যেন অনেকটাই অসহায়।

ভোটকেন্দ্রের আশপাশের পুরোটা এলাকা জুড়ে বেশ সংঘবদ্ধ আরেক দল মানুষকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। তারা প্রচণ্ড ব্যস্ত, কর্মতৎপর এবং খানিকটা উগ্র। ভোটকেন্দ্রের ফটকের দিকে যারা যাচ্ছে তাদেরকেই তারা ধরে ধরে জেরা করছে–কোথায় যাচ্ছেন, বাড়ি কোথায়, এনআইডি কার্ড দেখান ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন তারাই এখানকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে। এদের সবার বয়স আবার একই রকম নয়, কেউ কৈশোরের শেষের দিকে, কেউ তরুণ, কেউ আবার তারুণ্যকেও বিদায় জানিয়েছে দশ-পনেরো বছর আগে, কেউ কেউ আছেন যাঁদের বয়স ষাটের কোঠায়। এদের কারও শরীরে সরকার দলীয় প্রতীক ঝুলছে আবার কারও শরীরে ঝুলছে না; তবে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সবার উদ্দেশ্য একই রকম। এরা জেরা করেই সব ভোটারকে যে ভোটকেন্দ্রের দিকে যেতে দিচ্ছে তেমনটা কিন্তু নয়। বেশ কিছু ভোটারকে দেখা গেল এই বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পর যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে। এরকমই এক ভোটারের দিকে চোখ পড়ল আমার, ভোটের দিন বেশ টিপটপ হয়ে তিনি এসেছিলেন ভোটকেন্দ্রের দিকে। এই বাহিনী তাঁকেও ফিরিয়ে দিল, আমিও ফিরে যাওয়া সেই ভোটারের পিছু নিলাম। ভোটকেন্দ্র থেকে বেশ দূরে এসে একটি চায়ের দোকানে বসে তাঁর সাথে আমার আলাপ করার সুযোগ হল। কেন ভোট না দিয়ে ফেরত এলেন–এমন প্রশ্নের জবাব কোনভাবেই দিতে চাচ্ছিলেন না তিনি। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টার পর তিনি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে লাগলেন, কিছুটা মুখে, বাকিটা ইশারায়!

জানা গেল, পেশায় তিনি একজন পোশাক শ্রমিক, বছর তিনেক আগে কাজের খোঁজে বরিশাল থেকে সাভারে চলে এসেছেন, আবাস গেড়েছেন এখানকারই একটি মেসবাড়িতে। এবারই তাঁর প্রথম ভোট, ভোটারও হয়েছেন এই আসনেরই। নির্বাচনের দিন খোশমেজাজ নিয়ে এবং সুসজ্জিত হয়ে এসেছিলেন জীবনের প্রথম ভোট দিতে। তিনি এই এলাকার স্থানীয় না হওয়ার কারণে স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িত লোকজন তাঁকে সেভাবে চেনে না। তাঁর ভাষ্য মতে, এটিই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি ভোটকেন্দ্রের দিকে যাওয়ার সময়ই স্থানীয় রাজনীতি করা একদল লোক তাঁর গতিরোধ করে। তিনি ছাত্রদল/বিএনপির লোক কি না, জাল ভোট দিতে এসেছেন কি না–এজাতীয় কথা বলে বেশ কিছুক্ষণ ধমকাধমকি করতে লাগল। তারপর তাঁর ভোটার আইডি কার্ড থেকে পরিচয় জেনে নেয়ার পর জানিয়ে দেয়া হল, তাঁর ভোট দেয়া হয়ে গেছে, সে যেন চুপচাপ এখান থেকে সরে পড়ে। তিনি আমাকে আক্ষেপ নিয়ে বলতে লাগলেন, "আজ যদি এখানকার ভোটার না হয়ে নিজের এলাকার ভোটার হতাম, তাহলে অবশ্যই নিজের ভোটটা দিতে পারতাম।"

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগোলাম আরেকটি ভোটকেন্দ্রের দিকে। এবার যেটিতে গেলাম সেটি রাস্তার পাশেরই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভোটকেন্দ্রের মাঠে ভোটারদের দুটো সারি দেখা যাচ্ছে, তবে ভোটাররা ঢুকছে বের হচ্ছে কি না তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। এই ভোটকেন্দ্রের আশপাশেও আগের ভোটকেন্দ্রের মত জেরাকারী ও জটলাকারীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়েই আমি ক্যামেরা বের করে ভোটকেন্দ্রটির একটি ছবি নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম, ক্যামেরা বের করা মাত্রই আশপাশ থেকে জনা বিশেক লোক আমাকে ঘিরে ফেলল। ঘিরে ফেলেই নানাবিধ প্রশ্ন, জেরা! কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, এখানে ঠিক কী কাজ–এসব আর কি। আমি উত্তর দিলাম, ভোট দেখতে এসেছি। কয়েকজন পাল্টা বলেই বসল, ভোট দেখতে আসার কী দরকার, ভোট তো হচ্ছেই ভালমত। যারা আমাকে ঘিরে ফেলেছে তাদের সবারই বুকে দলীয় প্রতীকের লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো। বয়স্কমত একজন ব্যক্তি (যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলন স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে) আমার কানের কাছে এসে অনেকটা ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলেন, ভোট তো হচ্ছে ভোটের মতই। আমরা এলাকার লোকজনই ভোট করে দিতে পারব, আপনি বাইরের লোক, এখানে আপনার না থাকাটাই ভাল, কম বয়সী ছেলেপেলে যারা রাজনীতি করে তাদের মাথা বেশি গরম। এতটা ভালভাবে আপনার সাথে ওরা কথা বলবে না।

পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল নয় দেখে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন দুপুর ১২টা । ফিরে যাওয়ার পথে শুনলাম প্রথম যে ভোটকেন্দ্রটির বর্ণনা দেয়া হল সেটিতে নাকি সব ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। ভোট গণনার কাজ চলছে। ভোটকেন্দ্রটি ছিল এই ইউনিয়ন ও তৎসংলগ্ন এলাকার সবচেয়ে বেশি ভোটারের কেন্দ্র। কিভাবে মাত্র দুপুর ১২টার মধ্যেই সেখানকার সব ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গেল তা আমার বোধগম্য হল না কিছুতেই।

এই না বুঝে উঠতে পারা পরিস্থিতির মধ্যেই সাভার বাজারের ভোটকেন্দ্রগুলো দেখার উদ্দেশ্যে রিকশায় রওনা হলাম। রিকশাচালককে জিজ্ঞাসা করছিলাম তাঁর ভোটের বিষয়ে, তিনি কোন উত্তর দিতেই রাজি না। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর তিনি বললেন, "এই ভোট নিয়ে কারও সাথে কোন কথাই বলা যাবে না।" আমি আবারও তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই কেন যেন তিনি ভোট নিয়ে কারও সাথেই কোন কথা বলতে রাজি না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর একপর্যায়ে তিনি বললেন, "আপনি তো সরকারের লোক, আপনাকে কিছু বললে পরে আবার আমারই বিপদ হবে। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের দেখতে কোন দলই আসবে না।" তাঁকে আশ্বস্ত করা হল যে আমি সরকার দলীয় লোক নই। এবার তিনি জানালেন তাঁর ভোটের কথা। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে কয়েক পুরুষ ধরেই এখানে আছেন তাঁরা, ফলে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় তেমন কেউই তাঁর গতিরোধ করেনি। সকাল সকাল ভোট দিতে গিয়েছিলেন ভোটকেন্দ্রে, কিন্তু ভোটকক্ষে ঢুকে ব্যালট নিয়ে সিল দেয়ার গোপন কামরার দিকে যাওয়ার সময়ই কক্ষে থাকা সরকার দলীয় পোলিং এজেন্ট তাঁর গতিরোধ করেন। সাফ জানিয়ে দেয়া হয়, ভোট দিতে চাইলে গোপন কামরায় যাওয়া যাবে না, সবার সামনেই সিল মারতে হবে। তিনি খেয়াল করেন যে কক্ষে থাকা অন্য অফিসারদের কেউই এই পোলিং এজেন্টের কথার একটুও প্রতিবাদ করলেন না। বুঝে গেলেন যে কক্ষের বাকি সবাইও এই পোলিং এজেন্টেরই পক্ষের লোক। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে সবার সামনেই সিল মেরে ভোট ড্রপ করেন। যেহেতু সরকার দলীয় পোলিং এজেন্ট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই সরকার দলীয় প্রতীকে সিল মারা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তাঁর কাছে। আমি চুপচাপ তাঁর কাছ থেকে ঘটনা শুনছিলাম, পুরো ঘটনা বলার পর এবার তিনি উল্টো আমাকে প্রশ্ন করে বসেন, "তাহলে বলেন এইটা আমার কেমন ভোটের অধিকার পাওয়া হইল?" আমি এবারও নিঃশব্দ ছিলাম, তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর আমার কাছে ছিল না।

সাভার বাজারে গিয়ে দেখি, এই ইউনিয়ন এলাকার ভোটকেন্দ্রগুলোর তুলনায় এখানকার পরিবেশ কিছুটা উন্মুক্ত। হয়ত ইউনিয়নগুলোর সাপেক্ষে সাভার বাজার তুলনামূলক 'শহর' হওয়ার কারণেই। এখানে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় কেউ কারও গতিরোধ করছে না সেভাবে। তবে ভোটকেন্দ্রের রাস্তায় বেশ কিছু নির্বাচনি তাঁবু (টেন্ট) চোখে পড়ল, সবই সরকার দলীয় প্রতীকের। অন্য কোন প্রতীকের নির্বাচনি টেন্ট অনেকক্ষণ ধরে খুঁজেও বের করা সম্ভব হয়নি। সরকার দলীয় প্রতীকের নির্বাচনি টেন্টগুলো থেকে ভোটকেন্দ্রের দিকে যাওয়া প্রত্যেকটি মানুষের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। সাভার অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দেখা গেল, কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। তবে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকতে পারছিলেন খুব কম মানুষই, প্রতি পাঁচ/সাত মিনিট অন্তর অন্তর দু-একজনকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিলেন কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তবে যে জিনিসটি খুব বাজেভাবে চোখে বাঁধল তা হল, ইউনিয়নের ভোটকেন্দ্রগুলোর মত এখানেও পুলিশের চেয়েও বেশি তৎপর সরকার দলীয় প্রতীক শরীরে ঝোলানো সমর্থকরা। যেন তারাই এখানকার প্রকৃত আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পেয়েছে। পুলিশও তাদের কাছ থেকেই অনুমতি নিয়ে ভোটারদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে কেন্দ্রের ভেতরে। এরই মধ্যে নেতা গোছের কেউ একজন কেন্দ্রের গেটে এসে পুলিশের দুজনকে ধমকাতে লাগল কোন এক কারণে, সেই ধমকের কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক কেন্দ্রে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য ভোটার প্রবেশ একেবারেই বন্ধ হয়ে রইল।

সেখান থেকে যাওয়া হল সাভার উপজেলা কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত ভোটকেন্দ্রে। খেয়াল করলাম, সেখানকার পরিবেশ অনেকটাই স্বাভাবিক। কেউ কাউকে কোন প্রকারের চাপ প্রয়োগ করছে না, ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলেও চোখে পড়ল না, সরকার দলীয় প্রতীক গায়ে ঝোলানো বাহিনীর বিচরণও এখানে একেবারেই নেই। কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, উপজেলা কমপেক্স সরকারি এলাকা হওয়ার কারণে এখানকার ভোটকেন্দ্রে স্বাভাবিক ভোটগ্রহণই হচ্ছে। একই রকম চিত্র চোখে পড়েছিল সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের ভোটকেন্দ্রেও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে সরকার দলীয় প্রতীকের নির্বাচনি টেন্টের পাশাপাশি ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনি টেন্টও দেখা গিয়েছিল, যা এই আসনের আর যতগুলো ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিলাম তার একটিতেও দেখতে পাইনি। তবে পুরো নির্বাচনি আসনের মধ্যেই যে জিনিসটির অভাব সবচাইতে বেশি চোখে পড়েছিল তা হল নির্বাচনি পোস্টারের ভিন্নতা। আসনের প্রায় সব ভোটকেন্দ্রেই সরকার দলীয় প্রার্থীর নির্বাচনি পোস্টার ছাড়া আর তেমন কোন পোস্টার চোখেই পড়েনি। খুবই অল্প পরিমাণে তরিকত ফেডারেশনের হাতপাখা ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের মই প্রতীকের পোস্টার দেখা গিয়েছিল নির্বাচনি এলাকার কয়েকটি মহলায়, কিন্তু ভোটকেন্দ্র ও তার আশপাশে সেগুলোর অস্তিত্বও ছিল না। ভোটকেন্দ্রগুলোর যেদিকেই চোখ যায় শুধু নৌকার পোস্টার। যত মিছিলের স্লোগান কানে আসে সব নৌকার মিছিলের। অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রেই দুপুর ২টার পর থেকে নামেমাত্র ভোটগ্রহণ চলেছে। এমন কেন্দ্রও আছে, যেখানে এই সময়ের পর থেকে আর কোন ভোট দিতে ইচ্ছুক ভোটারকেই দেখা যায়নি, কোন কোন কেন্দ্রে এই সময়ের মধ্যে ভোট গণনার কাজও শুরু হয়ে গেছে। প্রায় সব কেন্দ্রের সামনেই সরকার দলীয় প্রতীকধারী লোকজন ছাড়া আর অন্য কোন প্রতীকধারী লোকজনকে জমায়েত হতে, এমনকি হাঁটাচলা করতেও দেখা যায়নি। নির্বাচনে নৌকা ছাড়া যে অন্য প্রতীকগুলোও আছে, অন্তত ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ দেখে তা বোঝারই উপায় ছিল না।

ছাত্রলীগ করি, ভোটটা তো আমি নৌকাতেই দিতাম, কিন্তু চেয়েছিলাম নিজের হাতে দিতে। জীবনের প্রথম ভোট দিতে পারলাম না, কেন্দ্রে ঢোকার আগে স্থানীয় ছেলেপেলেরা বলল ভোট নাকি হয়ে গেছে। দলীয় সরকারের অধীনে আরও যত দিন নির্বাচন হবে, আমি ভোট দিতে যাব না সেগুলোতে।

সারা দিন ঘটে যাওয়া অদ্ভুত তরিকার নির্বাচন দেখে সন্ধ্যা নাগাদ নিজের ডেরায় ফিরছিলাম। পথিমধ্যে এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল, মন খারাপ করে বসে আছে। সে সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনের কর্মী। স্বভাবসুলভভাবেই সে ভোট দিয়েছে কি না এবং তার মন খারাপ থাকার কারণ জানতে চাইলাম। বিরস বদনে সে বলল, "ছাত্রলীগ করি, ভোটটা তো আমি নৌকাতেই দিতাম, কিন্তু চেয়েছিলাম নিজের হাতে দিতে। জীবনের প্রথম ভোট দিতে পারলাম না, কেন্দ্রে ঢোকার আগে স্থানীয় ছেলেপেলেরা বলল ভোট নাকি হয়ে গেছে। দলীয় সরকারের অধীনে আরও যত দিন নির্বাচন হবে, আমি ভোট দিতে যাব না সেগুলোতে।"